**সুন্দরী প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক - এক ভ্রমণ কথা  
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়**  
  
(১)  
  
আমাকে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে ট্যুরের কোন বিষয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। মেয়ের কড়া হুকুম ছিল, "তোমার কোনো টিকিট বা হোটেল বুকিং করতে হবে না। এমনকি কে কে যাবে, কোথায় কোথায় যাওয়া হবে,কত টাকা পয়সা খরচা হবে সেসব কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা সব ব্যাবস্থা করব। তোমার কি লাগবে সেটা বলে দাও। "  
- আমি বললাম আমার ভোরবেলা গরম জল আর পাতিলেবু, বাতাসা লাগবে। বাথরুমে  ইউরোপীয়ান স্টাইল কমোড থাকা চাই। রাতে রুটি আর সূর্য ডোবার পর আহ্নিক এর সময় কিছু ভাজাভুজি।   
- তুমি একটা জলের ফ্লাস্ক আর গেলাস সঙ্গে করে নিয়ে যেও।   
- তথাস্তু   
  
যাইহোক ব্যাপারটা যদি আমার চেনাশোনা জায়গায় হত তাহলে কোনো অসুবিধে নেই, তাও আমি আমার স্কুল কলেজের বন্ধুদের সাথে ফোন টোন করে কিছু ইনফরমেশন জোগাড় করলাম আর আটজনের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করলাম। অনেক জল্পনা কল্পনা করে মোটামুটি একটা ছক তৈরী হল। আমরা নেপালের তিনটে জায়গায় দুদিন করে থাকব। কাঠমান্ডু, পোখরা আর চিতওয়ান। একদিন হাতে রাখা হবে কোথাও বেশী ভাল লাগলে বা কোনো এমারজেন্সি  হলে যেন এডজাস্ট হয়ে যায়।  
এইসব কথা হচ্ছে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে মোটামুটি জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যাব। আমি ভাইজ্যাক থেকে কলকাতার যাওয়া আসার টিকিট করে ফেললাম। আসলে ওদের একসাথে আট দিনের ছুটি পাওয়া খুব চাপের। একমাসও হয়নি চাকরিতে জয়েন করেছে। তবে ওরা অনেক গুলো এক্সট্রা ডিউটি করে ছুটি জমিয়ে ফেললো।   
নেপালে তো অনেকভাবে যাওয়া যায়। প্রথমতঃ সোজা ফ্লাইটে কাঠমান্ডু। কিন্তু কলকাতা থেকে দুবাইয়ের ভাড়া কাঠমান্ডুর থেকে কম। অত খরচা চলবে না। ট্রেনে গেলে রক্সৌল বা গোরখপুর পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ভাড়া করে নেপালে ঢুকতে হয়। কোথাও ট্রেনের টিকিট পেলাম না। তৎকাল খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর এক উপায় শিলিগুড়ি থেকে কাকড়ভিটা হয়ে অনেক ঘুর পথে কাঠমান্ডু যাওয়া। বাস আছে, ১৬ ঘন্টা সময় নেয়। এক একজনের ভাড়া ২৫০০ টাকা করে।  
সমস্ত কিছু চিন্তার মধ্যে রেখে ওরা ঠিক করলো একটা গাড়ি সাত দিনের জন্য ভাড়া করে নেপাল যাওয়া হবে। সেইমত শিলিগুড়ির এক ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে কথা বলে নেপালী ড্রাইভার সমেত একটা টাটা সুমো গোল্ড (মোটামুটি নতুন) দৈনিক ৩০০০ টাকায় সাত দিনের জন্য ভাড়ায় নেওয়া হল। ডিজেল আর ড্রাইভারের খাইখরচা আমাদেরই দিতে হবে।  
সঙ্গে তিন তিনটে ডাক্তার। আশুতোষ অর্থোপেডিক্স, পর্ণা স্কিন আর মাম্পু চেস্ট। অনেকেই আমাদের সাথে আসবার জন্য উৎসাহ দেখিয়েছিল কিন্তু ওরা কড়া হাতে স্ক্রিনিং করে মাত্র ছয়জনের গ্রুপ তৈরী করা হল। আশুতোষ এর মা বাবার আসার কথা থাকলেও আসতে পারে নি, উনি বাংলাদেশে চাকরি করেন। পর্ণা আর পর্ণার মা, আশুতোষ, মাম্পু আর মাম্পুর মা এবং আমি।আমাদের মধ্যে সিনিয়র সিটিজেন পর্ণার মা। সদ্য এবছরই নর্থ ইস্টার্ন রেল হাসপাতালের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন।

(২)  
  
রাতে তো ছিলাম নর্থ ইস্টার্ন রেল হাসপাতালের গেস্ট হাউসে। একেবারে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কম্পাউন্ডের মধ্যে। আমি আমার স্বভাবমতো ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে চানটান করে একটু হাঁটাহাঁটি করে রাস্তার ধারে ঝুপড়ি দোকান থেকে গরম গরম রুটি ঘুগনি খেয়ে ছটার মধ্যে রেডি। বাকি সবাইও। গাড়িও এসে গেল ঠিক সময়। সাতটার মধ্যে ফটো সেশান শেষ করে মালপত্র গাড়ির ছাদে বাঁধাছাঁদা করে বেরিয়ে পড়লাম। পানিট্যাঙ্কি যাব। ওটাই পশ্চিমবঙ্গের  ভারত নেপাল সীমান্ত। ওখানেই টিফিন করা হল। আটটায় বর্ডার খুললে আমরা আবার থামলাম কাকরভিটায়। ওটা নেপাল সীমান্ত। ফোনের নেটওয়ার্ক চলে গেল। একেবারে আউট অফ সার্ভিস বলে দিল। ওখানে আধার কার্ড জেরক্স জমা দিয়ে নাম ঠিকানা লিখে ইমিগ্রেশন অফিসে যেতে হল। সেখানে গাড়ির পারমিট বের করতে হবে। শুরুতেই বিপত্তি। লিঙ্ক ফেল। সে এক বিরক্তিকর ঝামেলা। পাক্কা দু'ঘন্টা বসে থাকতে হল। অবশ্য আমরা সেই সময় ভারতীয় টাকা নেপালী টাকায় এক্সচেঞ্জ করে নিলাম। ভারতের পাঁচ হাজার নেপালের আট হাজার দেয়। হোটেল সব বুকিং ডট কম এ নেওয়া আছে।   
লিঙ্ক আসার পর গাড়ির পারমিট হল। এবার রুট পারমিট করতে হবে, যেতে হবে আরটিও অফিসে।  কাছেই, তবু অনেকটা সময় নষ্ট হল। তারপর আমরা নিলাম লোকাল সিম। ছবি, আধার কার্ড দিয়ে সিম দিয়ে দিল। আধঘন্টায় এক্টিভেট হয়ে গেল। আমরা দুটো সিম নিলাম। কাঠমান্ডুর দিকে যাত্রা শুরু হল তখন বারোটা বেজে গেছে। চা টা আমাদের সঙ্গেই আছে। বার দুয়েক চা হয়ে গেছে। রাস্তা খুব ভাল, চওড়া মসৃণ। খুব স্পিডে গাড়ী চলছে। এখান থেকে ৬১৫ কিলোমিটার কাঠমান্ডু। প্রথম সাড়ে চারশো কিলোমিটার প্লেন রোড, তারপর ঘাটি। কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই, ডাবল রোড। রাস্তার দুপাশে অল্প কিছু বাড়ি, রুক্ষ অনাবাদি জমি। সেচ ব্যবস্থা মনে হয় খুব একটা ভাল নয়। তিনটে নাগাদ প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার চলার পরে আমাদের ড্রাইভার মিল ছেত্রী বলল এখানে কিছু খেয়ে নিই। আমরা মানে আমি আর মিল খাসির মাংস (চামড়া সমেত) আর ভাত খেলাম। পর্ণার মায়ের একাদশী তাই ফল আর বাকিরা সবাই অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে ম্যাগি খেল। আধঘন্টার মধ্যে আবার যাত্রা শুরু। সন্ধ্যা ছটায় থামলাম পাহাড়ের কাছে এসে। একটা মাড়োয়াড়ি দোকানে খাঁটি দুধের চা একদম মালাই মারকে। ফোনের ঘড়িটা কখন যে পনেরো মিনিট এগিয়ে গেছে  বুঝতেই পারিনি। মাম্পুর ফোনে নতুন সিম। আর আমার ফোনটা ক্যামেরা হয়ে গেছে। সাড়ে ছটার সময় যখন আমরা পাহাড়ি রাস্তা ধরলাম তখনও গনগনে সূর্য। এখানে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আলো থাকে।  
পাহাড়ের রাস্তাও ভাল। বেশ চওড়া, আরাকুর মতো, খুব একটা ঢাল নেই। গাড়ি থার্ড গিয়ারে চলছে। আসল বিপত্তি হল ঘন্টা দুয়েক পরে। একে অন্ধকার, তায় বৃষ্টি শুরু হল। বেশ ঝেঁপে বৃষ্টি। কি একটা রিজার্ভ ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, আরো গাড়ি যাচ্ছে। কাঠমান্ডু এখনও ঘন্টা তিনেকের রাস্তা। একটা ফরেস্ট চেকপোস্টে ধুম বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি আটকালো। জনা চারেক নেপালী রেনকোট পড়ে ছাতা নিয়ে আমাদের গাড়ির ওপর হামলে পড়লো। বলে চেকিং হবে, সব কাগজপত্র নিয়ে মিলকে খুব বকাঝকা করছে। মিলকে এই মারে তো সেই মারে। পুরো ঘেঁটে ঘ। মিলের থেকে জানতে পারলাম, ওরা বলছে রাত আটটার পর বিদেশি গাড়ির এই রাস্তা দিয়ে যাবার হুকুম নেই। গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে যাও, কাল সকাল আটটার পর আসবে। ওদিকে তখন রাত সাড়ে নটা, কিছুতেই ছাড়বে না। হাজার টাকার নোটও গলাতে পারছে না। সমূহ বিপদ। কোন উপায় না দেখে দুহাজার টাকার ইন্ডিয়ান নোট দিয়ে এবার পথে নামলাম আমি। পরিস্কার হিন্দিতে বলল, স্যার, সামনে আরও তিনটে চেকপোস্ট আছে, ওখানে কি করবেন? রাস্তায় বাইসন আছে, গাড়ি উল্টে ফেলে দেবে। তার থেকে আমাদের রেঞ্জারের সাথে কথা বলুন। বলবেন, আমরা সিন্ধুলি যাব, হোটেল বুকিং আছে রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছিল ওটুকু রাস্তা যাওয়ার পারমিশন দিন।   
এমনিতে কোনো বিষয়ে আমার মাথা ঘামানোর কথা নয়, তবু পরিস্থিতি বুঝে এগোতে হল। টাকা পয়সা কিছু লাগলো না, এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সিন্ধুলি বলে একটা গ্রাম আছে সেখানে রাত কাটাতে হবে। লোকাল ফোন নম্বর দিয়ে অফিসারের নম্বরটা নিয়ে চুপচাপ সিন্ধুলি।   
বেশ চওড়া রাস্তার দুদিকে আট দশটা হোটেল। তখন রাত দশটা বাজে, ঠান্ডা একেবারেই নেই, ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। আমরা খুব সহজেই এবং সস্তায় থাকার হোটেল পেয়ে গেলাম, তবে কি ততক্ষনে ওদের রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার উল্টোদিকে এক সর্দার হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা। রুটি,ডালমাখনি, পনীর আর পাতিয়ালা একটা সিগনেচার। হোটেলে এসে শুয়েছি আর ঘুমিয়েছি। এই সময় কিন্তু মাম্পু কাঠমান্ডুর হোটেলের সাথে কথা বলে বুকিং এর ডেটটা একদিন পিছিয়ে দিয়ে, পোখরাতেও তাই করে পাকা বন্দোবস্ত করে ফেললো।  
সকালে ঘুম ভাঙলো পাঁচটায়, বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ফোনগুলো চার্জিং এ বসিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। নটায় ওয়াকিং করতে বেরোলাম, তখনো সবাই গভীর ঘুমে। সিন্ধুলি আড়ে বহরে বড়জোর এক কিলোমিটার এর গ্রাম। হয়তো মূল গ্রামটা ভেতরদিকে, মাঝখানে বাসস্টপ। হৈ হৈ করছে কিছু লোকজন। রেস্টুরেন্টে অনেক লোকের ভীড়। রাস্তায় চললে দু'দিকে ঘন সবুজ পাহাড়। রাস্তার পাশ দিয়ে একটু নীচে তিরতির করে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে একটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে। এক কথায় অসাধারণ জায়গা। বড় বড় ক্যামেরা হাতে সাদা চামড়ার লোকজন। এখানে নাকি অনেক বিরল প্রজাতির পাখি/পোকা মাকড় দেখা যায়। এটা একটা জংশন। সিন্ধুলি কাঠমান্ডু লোকাল বাস সার্ভিস আছে।

(৩)  
  
লুচি তরকারি কফি খেয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করে গাড়ির ছাদে মালপত্র তুলে কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে বেরোতে বেরোতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। রাস্তায় একটা আয়নাওয়ালা মন্দির পড়লো। ভেতরে একটা ব্যাঁকাচোরা পাথর আর শেরওয়ানী পড়া বেশ সুপুরুষ এক ব্যাক্তির ছবি। ওখানে সবাই পুজো দিয়ে মন্দিরের পাশে পাহাড়ের দেওয়ালে পেরেক পুঁতে একটা করে আয়না আটকে দিয়ে যায়। ছোট বড় হাজার হাজার আয়না। অনেক দূর থেকে পাহাড়ের গা রোদে চকচক করে। রাস্তার পাশে পাশে এক নাম না জানা নদী চলেছে। এই নদীটা অদ্ভুত, পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলেছে। গন্ডকীতে মিশেছে। রাস্তা থেকে নদীর ওপারের পাহাড়ের সংযোগকারী হ্যাঙ্গিং ব্রীজ অনেকগুলো আছে। সাধারনতঃ স্কুল বা রাস্তার জংশনের কাছে একটা ব্রীজ আছে। আমরাও একটা স্কুলের মাঠে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ব্রীজে চড়লাম। তাতে চারচাকার গাড়ি যায় না, কিন্তু বাইক যায়। তবে গ্রামের লোকেরা মাথায় পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে হেঁটেই যাতায়াত করছে। একশো মিটার লম্বা হবে। তলায় কাঠের পাটাতন পাতা। অনেক ছবি তোলা হল।   
রাস্তায় পড়লো দক্ষিণ কালীমন্দির, কাটমান্ডু ঢোকার মুখে। আমরা গাড়ি থেকেই প্রনাম জানিয়ে থামেল বলে একটা জায়গায় এলাম। এখানেই আমাদের থাকার জায়গা, হোটেল। পাশেই রয়েলস ক্যাসিনো আর ন্যাশনাল মিউজিয়াম। যা বুঝলাম থামেল হল কাঠমান্ডুর ধর্মতলা।   
প্রচন্ড ঘিঞ্জি অঞ্চল। কংক্রিট জঙ্গল। উঁচু নিচু সরু সরু রাস্তা। ছেলে ছোকরারা পোঁ পাঁ করে বাইক নিয়ে ঘুরছে। মেয়েরা সব দোকান চালাচ্ছে। সব জিনিসের প্রচন্ড দাম। অতি সাধারণ একটা হোটেলে, যেখানে প্রচূর সাধারণ মানুষ ভীড় করে খাচ্ছে সেরকম একটা হোটেলে আমরা ছয়জন নিরামিষ থালি আর শুধু দুপ্লেট চিকেন কারি নিলাম। বিল হল পাঁচ হাজার টাকা। ভাবা যায়? অবশ্যই জিএসটি নেই এবং নেপালী টাকা। বিকেলে পার্ক মিউজিয়াম আর থামেল মার্কেট  হেঁটে হেঁটে ঘুরলাম। ক্যাসিনোতে ঢুকতেই সবাই মিলে এমন করলো যেন আমি ঘর বাড়ি বেচে জুয়া খেলতে যাচ্ছি, মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মত রাজত্ব বাজি রেখে .......... যে সেল্ফিটাও না তুলে বেরিয়ে আসতে হল। ষাটটা অপশন, দুটো করে বল ফেলছে একবারে। পরপর দশটা নম্বরে টিকিট নিলে জেতার প্রবাবিলিটি অনেক বেশী। কিন্তু কে শোনে কার কথা। নূপুর তো বলেই দিল, তার ভাগনে বউয়ের পিসতুতো দিদির খুড়শ্বশুর এর বাল্যবন্ধু নাকি জুয়ায় বাজি রেখে হেরে সর্বসান্ত হয়ে গেছিলো একদিনে।  
কি আর করা যাবে, সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। এখানে আমাদের হোটেলে একটা এ্যাপার্টমেন্ট নেওয়া ছিল। মানে তিনটে ঘর,কিচেন ডাইনিং ড্রইং মিলিয়ে খুব ভাল ব্যাবস্থা। শুধু তিনতলায় এবং লিফট নেই।   
হোটেল রেস্টুরেন্টে অর্কেস্ট্রা ওয়ালা বার। আমরা স্যালাড আর কফি বানিয়ে নিলাম, রুটি তরকারি হোটেল থেকেই এলো।  
  
পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ পশুপতিনাথ। হনুমান ধোঁকা মন্দির দেখে পশুপতিনাথ গিয়ে অনেক দূরে গাড়ি পার্কিং করে মন্দির দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। সবচেয়ে অদ্ভুত এখানে মন্দিরেই শ্মশান। নেপালীরা মনে করে মানুষ মরে যাওয়ার পর ভগবানের সাথে মিশে যায়। তাই মন্দিরে নিয়ে এসে জ্বালিয়ে দেয়। বিকেলে সন্ধ্যাআরতি আর চিতা একসঙ্গে জ্বলে। সে বিশাল ব্যাবস্থা। অন্ততঃ চারটে চিতা দাউদাউ করে জ্বলছে মশাল নিয়ে আরতি হচ্ছে। মাঝে মাঝে হর হর মহাদেব শব্দ কানে আসছে। আবার মন্দিরের সামনের দিকে অনেক সুন্দর বসার জায়গা। আমরাও বসলাম, ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে বিক্রি করছে। মন্দিরের পূজারী গুলোও মনে হল হিন্দুস্তানি। সূর্য ডোবার সময় গোল হয়ে বসে আমি একটু ধর্মকথা শুরু করলাম। কেদারনাথে শুনেছিলাম এই গল্পটা।  
মহাভারতের পান্ডবরা পাশা খেলায় রাজত্ব হারাবার পর শ্রীকৃষ্ণর কথামত পুনরায় শক্তি অর্জন এর জন্য বিভিন্ন দেবতার আর্শীবাদ পাবার জন্য ধ্যানে বসে। ক্রোনোলজি অনুসারে ভীম শিবের ধ্যান করেন। কঠিন তপস্যার মাধ্যমে ভীম শিব ঠাকুরকে মর্ত্যে নিয়ে আসে। শিবও তুষ্ট হয়ে ভীমকে বর দেওয়ার কমিটমেন্ট করে ফেলে। আর তখনই ভীম বলে, তোমার সমস্থ শক্তি আমায় দিয়ে দাও। শিব দেখে বেগতিক,  সমস্ত শক্তি দিয়ে দিলে তার কি হবে? তবু ভক্তমনে কষ্ট দেওয়াটা শিবঠাকুর ঠিক মনে করেননি। বলেন ঠিক আছে আমায় ধরতে পারলে একবারের জন্য আমার সব শক্তি পাবি। বলেই উত্তরের দিকে ছুটতে থাকেন। শিবও ছোটে তার পিছনে ভীমও ছোটে। শিব রূপ বদলে বদলে ছোটে, আর ভীমও ছাড়ার পাত্র নয়। বাবা পবন আর দাদা হনুমানের সাহায্য নিয়ে শিবের পিছনে ধাওয়া করে। হিমালয় পর্বতশ্রেণীর কাছে এসে শিব মহিষের রূপ ধরে পাহাড়ে চড়তে শুরু করে। শেষে এক পাহাড়ের উপর ভীম মোষের পিছনের পাদুটো ধরে ফেলে। শিবও মাথাটা পাহাড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।  
কেদারনাথ হল মোষের পিছনটা আর পশুপতিনাথ হল সেই মোষের মুখটা।   
ভীম তার বর পেয়েছিল। যুদ্ধে তা ব্যবহারও করেছিল। আজও কেদারনাথে মোষের পিছনদিক শিব রূপে পুজো হয় আর পশুপতিনাথে মোষের মুখ। গলা থেকে মুখ। খুব জাগ্রত।

(৪)  
  
আজকে সক্কাল সক্কাল পাততাড়ি গুটিয়ে কাঠমান্ডুর মায়া ত্যাগ করলাম। এখন যাব মনকামনা মন্দির। কালীমন্দির, শক্তিপীঠ। মায়ের অঙ্গ পড়েছিল। এটা কাঠমান্ডু থেকে অনেক দূর। পোখরার রাস্তায় পড়বে। গাড়িতে তিনঘন্টা সময় লাগলো। এখানে কেবল কার করতে হবে। অনেক উঁচু পাহাড়ের মাথায় মন্দির। কেবল কার নীচে থেকে উপরে চলে। নেপালী টাকায় ৮৩৫ টাকা এক একজনের টিকিট। চারদিকে কাচ লাগানো বক্স। ছয়জন করে বসার জায়গা। অনেক উঁচু, গুলমার্গ এর দুটো কেবল কারের চেয়েও বেশী রাস্তা। সোঁ সোঁ করে মেঘের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে চলল। ভয় তো একটু করছিলো, তবে এটাই মন্দিরে যাবার পথ। পায়ে হেঁটে উঠলে সে পনেরো কিলোমিটার রাস্তা দশ ঘন্টা লাগবে।  
মন্দিরে বিশাল লাইন। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন ভোগ নিবেদন হচ্ছে। প্যাগোডা স্টাইলের মন্দির। সবাই বেশ ভক্তিভরে পুজো দিল। তবে নেপালে বাঙালী পর্যটকদের সংখ্যা খুবই কম। এখানে তো একজনও বাঙালী দেখলাম না। ওখানেই কিছু খেয়ে নীচে নামলাম তখন প্রায় চারটে বাজে। মাম্পু জিজ্ঞেস করলো, "বাবা তুমি ঠাকুরের কাছে কি চাইলে?"   
- আমি বললাম, "যতদিন বাঁচব ততদিন যেন নিজের পয়সায় রোজ দেড় পেগ স্কচ খেতে পারি"। অবশ্য ততক্ষণে আমরা সবাই গাড়িতে উঠে গেছি। ঘন্টা দুয়েকের জন্য রামায়ন মহাভারত শুরু করিয়ে দিয়ে চুপচাপ মাস্কটা চোখে লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।   
একজায়গায় দেখি গাড়ি গেছে আটকে। সামনে অনেক গাড়ি। পাড়ার ছেলেমেয়েরা কেউ শশা, কেউ আম, কেউ ঝালমুড়ি বিক্রি করছে। রাস্তার বাঁদিকে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আর ডানদিক দিয়ে শুধু এম্বুলেন্স যাচ্ছে। সামনে ল্যান্ড স্লাইড হয়েছে। কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কেউ জানে না। আমার তো এখানে মাথা ঘামিয়ে কোনো কাজ নেই। বিন্দাস চাকার পেছনে পাথর লাগিয়ে, জানলা দরজা খুলে চা বানাতে লেগে পড়লাম। এখানকার লোকেরা বাজারদর ঠিক জানে না। একটা বড় শশা(খুব ভাল খেতে)৫০ টাকাতে বিকোচ্ছে অথচ ১০ টাকায় চারটে কাগজি লেবু। মিল সব দেখে এসে বলল, রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে এবার ছেড়ে দেবে। বলতে বলতে উল্টো দিকের গাড়ি চলা শুরু হল। আমাদের যখন ছাড়লো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আলো আঁধারের মধ্যে তখনও ধসের জায়গাটায় কাদা মাটি আর একদম কিছু নুড়িপাথর পড়ছে। অবশ্যই অনেক লোকজন আছে। বাসের লোকজন নামিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ঠিকই পাশ হয়ে গেলাম। কিন্তু পোখরা অনেক দূর, রাস্তাও খারাপ। খানা খন্দে ভরা। গাড়ি হেলতে দুলতে একদম আস্তে আস্তে চলছে। তার ওপর আবার বৃষ্টি শুরু হল। রাস্তার ঝাঁকুনিতে জানলার কাচের হ্যান্ডেলে আশুতোষের মাথা ঠুকে আলু। বেচারা লম্বা মানুষ, পিছনে বসেছিল। রাত দশটা নাগাদ পোখরার কাছাকাছি একটা ধাবাতে ডিনার। রুটি তরকারি চিকেন সবই পাওয়া গেল তার সঙ্গে পাওয়া গেল নেপোলিয়ন। খুব সামান্য বৃষ্টি,পাহাড়ের কোলে, রাস্তার ধারে বিরাট বীচ আম্ব্রেলা লাগানো টেবিল চেয়ারে বসে গরম গরম খাবার। পুরো পয়সা উশুল। আমাদের দেখাদেখি আরও দুটো গাড়ি ওখানে এলো। দুটোই ইন্ডিয়ার গাড়ি, শিলিগুড়ির গাড়ি। পোখরা যাচ্ছে।

(৫)  
  
পোখরা জায়গাটা খুব সুন্দর, পরিস্কার। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝে একটা বিরাট লেক, লম্বাটে, ন্যাচারাল, শেষ দেখা যায় না। সাথে অনেকটা সমতল জায়গা। লেকের একদিকে খাড়া সবুজ পাহাড় অন্যদিকটা বাঁধানো। চওড়া পিচের রাস্তা তার পাশে পাশে হাজারো হোটেল রেস্টুরেন্ট। এখানেই  একমাত্র সব দোকানের নাম, হোর্ডিং ইংরিজিতে। বাকি সারা নেপালে সবকিছু হিন্দিতে লেখা। নেপালী ভাষার বোধহয় অক্ষর হয় না, মানে রাস্তায় ঘাটে কিছু চোখে পড়েনি। আমি তো রোজকার মতোই পাঁচটাতে ঘুম থেকে উঠে, ফ্রেস হয়ে ট্র্যাকশুট পড়ে হাঁটতে বেরিয়েছি। প্রচুর সাহেব মেম ওয়াকিং করছে। হালকা মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি নেই। সাতটায় হোটেলে ফিরে চানটান করে সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম। এ জায়গাটা বেশ বিলেত বিভুঁই লাগছে। এখানে সব হোটেলে, রেস্টুরেন্টে এমনকি কফিশপেও ফ্রি ওয়াইফাই। আমরা টিফিন করতে যে রেস্টুরেন্টে গেলাম তার নাম "Hunger's eye"  
পর্ণার মা বলল,"আমাগো দ্যাশে এটারেই কয় চক্ষুখিদা, যাই দেহ্ খাওনের লগে মন করবে"। সবকিছুই চেনা খাবার আছে। আমি থুকপা খেলাম। দার্জিলিং এও খেয়েছি, কলকাতার চায়না টাউনেও খেয়েছি তবে এটা বেশী সুস্বাদু। বিভিন্ন রকমের রংবেরঙের সবজি আর নুডুলস্ আর তিনভাগ জল দিয়ে সিদ্ধ করা। একটা ডিমের অমলেট সরু সরু করে কেটে মস্ত এক জামবাটিতে করে দিল, এক্কেবারে ধোঁয়া ওঠা। নুন, গোলমরিচ, ভিনিগারে ভেজানো লঙ্কা, টমেটো সস,চিলি সস আরও দুটো অদ্ভুত দেখতে (বিকট গন্ধ) সস আলাদা করে দিল। স্বাদ অনুযায়ী মিশিয়ে নিতে হবে।  
আমরা লেকে বোটিং করলাম। প্যাডেল বোটের দুপাশে দুটো নৌকো। দশবারো জন বসতে পারে। এমনিতে জিনিসটা অনেক বড়। ডোববার কোনো চান্স নেই। একঘন্টার ভাড়া ১৫০০ টাকা। প্যাডেল করার জন্য ওদের লোক থাকবে। জলের মধ্যে একটা মন্দির আছে, সেখানে নিয়ে গেল। শান্ত কালচে সবুজ নিস্তরঙ্গ গভীর  জল।বোট যেন মোজাইক টাইলসের উপর স্লিপ কেটে এগিয়ে চলেছে। কোনো দুলুনি নেই। হাইওয়েতে বিএমডব্লিউ গাড়িতে যাওয়ার মতন। কোথা দিয়ে একঘন্টা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।   
বোট থেকে নেমে সটান গাড়িতে উঠলাম। এবার যাব গুপ্তেশ্বর মন্দির আর দেবীস ফল।ওগুলো একই জায়গায়। প্রথমে দেবীস ফল। টিকিট কাটতে হয়। খুব খরস্রোতা এক ঝরনা। এ ঝর্ণার পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকলেও কবিতা আসবে না। শব্দে কানে তালা ধরে যাবে। দুর্বার গতিতে প্রচন্ড শব্দে হাঁউ মাউঁ করে পাহাড় থেকে বিশাল এক অন্ধকার গুহার মধ্যে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। দেখার মত জায়গা।  
গুপ্তেশ্বর অতল গভীরে।  মন্দিরের প্রবেশ পথটা বড়সর অনেক বসার জায়গা অনেকগুলো বড় বড় পেডেস্টেল ফ্যান। সিঁড়ি নেমে গেছে। প্রায় শ দুয়েক সিঁড়ি নামার পর একটা বাঁকের কাছে সব অন্ধকার হয়ে গেল। এরপর পাথরের গুহার রাস্তা।  মাথাটা অনেকটা নামিয়ে চলতে হচ্ছে। খুব ছোট ছোটো ধাপ কাটা, সবসময় সবদিক থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। ভীষণ পিছল। জুতোয় ভাল গ্রীপ না থাকলে সরসরিয়ে পড়ে যাবার খুব চান্স। গুহা সরু থেকে আরও সরু হতে লাগলো। পাথরের দেওয়ালে একটু দূরে দূরে টিমটিমে আলো।ক্লীট ওয়ারিং করা বোধহয় ভোল্টেজ কম করা, কারেন্ট মারছে না। চারদিকে জল থৈথৈ  সে এক অলৌকিক পরিবেশ। এবারে একটা জায়গায় অনেকটা চওড়া ফাঁকা, এখানেই শিবলিঙ্গ। দু তিনজন পুরোহিত আর ভীড় করে লোকজন। জল সমানে পড়ছে। আরও অনেক তলায় যাওয়া যায়। এখানটা সিমেন্ট  বাঁধানো সিঁড়ি। নীচে গিয়ে দেখি ঐ দেবীস ফল ওখানে সশব্দে পড়ছে কিন্ত আশ্চর্য তারপরই একদম শব্দ নেই। কোথায় জল কোথায় আওয়াজ। এখানকার লোকে বলে মহাদেব এইখানে দেবীকে ধরে বেঁধে ফেলেছিল। স্যাঁকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। সত্যিই অদ্ভুত, মনে রাখার মত।  
শিবলিঙ্গের চারপাশে অনেক ধূপ ধুনা মশাল জ্বলছে, কিন্তু কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ভাল করে দেখলাম একটা ন্যাচারাল চিমনি। ধোঁয়াগুলো কুন্ডলী পাকিয়ে পাহাড়ের এক গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। জামা জুতো টুপি ভিজিয়ে ওপরে উঠে একটু বসে পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে নিলাম। চা ও পেয়ে গেলাম।  
হোটেলের কাছে এসে গাড়ি থেকে আমি আর নূপুর নেমে পড়লাম। বাকি সবাই ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে গেল কফি খাবে বলে। এখানে কৃষ্ণ মন্দিরও প্যাগোডা স্টাইলে। চন্দননগরে রবিঠাকুরের বাড়িটার মত লেকের জলে ঝুল বারান্দায় কৃষ্ণ মন্দির। অনেক বসার জায়গা। টুপিটা খুলে কোনের দিকে নিরালা পরিস্কার একটা বেঞ্চে,  গোধুলির আলোমাখা আকাশপটের মধ্যে পাখির কলতানে মুখরিত সন্ধ্যায় একটু জীবনের চাওয়া পাওয়ার গল্প আর  ...... এই ঝালমুড়িওয়ালা, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ৫০ টাকার মুড়ি বানাও তো, আচারের তেল দিও।

(৬)  
  
  
আজ পোখরায় দ্বিতীয় সকাল এবং টেনশন। গতকাল রাতে নেপালের এক অখাদ্য বিরিয়ানি, মনে হচ্ছে সরষের তেলে রান্না করা, চপচপে মেয়োনিজ, ভাতগুলো গলা। মানে এত বাজে বিরিয়ানি তেলেগুরাও রাঁধতে পারবে না। তা আজকে ওয়াকিংটা একটু বেশীই করলাম। চার চারটে এটিএম ঘুরে এলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত খরচাপাতি হয়ে ক্যাশ টাকা শেষের দিকে। অবশ্য আমার কাছে পাঁচটা দু হাজারের নোট লুকিয়ে রাখা আছে, সেটা কাউকে বলিনি। আমি তো কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাব না তাই চুপচাপ দেখে যাচ্ছি। এখন আমার কাছে তিনটে ডেবিড কার্ড দিয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এটিএম এ ট্রাই করছি। টাকা কনভারসন সব দেখাচ্ছে, কিন্তু টাকা আসছে না। ঘেমে-নেয়ে শেষে ক্রেডিট কার্ড দিয়েই ক্যাশ নেবার চেষ্টা করলাম। এবারও হল না। আমার HDFC ইন্টারন্যাশনাল কার্ড তবু টাকা আসছে না। ওদের ফোন করা শুরু করলাম। কাছেই একটা কফি শপ থেকে ওয়াইফাই দিয়ে গুগল ডুয়ো, হোয়াটসএ্যাপ সব ট্রাই করলাম, শুধু শুধু আমায় ১৫০ টাকা দিয়ে অর্গানিক চা খেতে হল। HDFC হোয়াটসঅ্যাপে রেসপন্স দিল। অনেক ম্যাসেজ চালাচালির পর একজনকে ফোনে ধরা গেল। সে সব দেখেশুনে বলল, আপনার ইন্টারন্যাশনাল ফেসিলিটি এক্টিভেট  করা নেই, করে দিচ্ছি। একটা OTP আসবে আমায় বলুন।  
- আরে ফোন তো আউট অব সার্ভিস ম্যাসেজ কি করে আসবে? হোয়াটসঅ্যাপ বা মেলে আসবে কি?  
- আমাদের রেকর্ডে আপনার মেল এড্রেস নেই।  
- তা এখন নিয়ে নিন।  
- তাতেও OTP আসবে  
- ব্লা ব্লা ব্লা অনেক কথা বললাম কিন্তু চাপটা ভালই।  
খুব একটা নিতে পারছিলাম না, বেশ খানিকক্ষণ ব্রিদিং এক্সারসাইজ করে হোটেলে ফিরে লুকোনো টাকাগুলো (নেপালে ইন্ডিয়ান কারেন্সি সব জায়গায় চলে, হিসেব মত আমার কাছে ১৬০০০ টাকা আছে) একবার দেখে নিয়ে ভাবলাম, এখানকার শুধু গতকালের খাবার আর কিছু জল আর কফির দাম দিতে হবে। দশ হাজার টাকার পেট্রল ভরলে ফিরে যাওয়া যাবে। কিন্তু আর দুদিন চিতওয়ানে কি হবে? ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। নটায় আবার উঠে মাম্পুকে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বললাম। উদ্বিগ্ন হয়ে শুনে কি সব চিন্তা করে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, ও আশুতোষ সব দেখে নেবে, ওর অনেক এমআর এর কানেকশন আছে তুমি চিন্তা করোনা, ঘুমিয়ে পড়।  
মিনিট পনেরো পর দেখি আশুতোষের ঘরে, মাম্পু পর্ণা আর আশুতোষ মিলে কি সব যুক্তি পরামর্শ করছে। আশুতোষ সিগারেট  খায়। ইতস্তত করছিল, পারমিশনটা দিয়েই দিলাম। ডেবিট কার্ড কাজ করবে না, ওদের কারো কাছেই ক্রেডিট কার্ড নেই। ফোন পে, গুগুল পে, হোয়াটসএ্যাপ পে কিছুই কাজ করছে না। এখানে লোকাল কারো ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টেও টাকা পাঠানো যাচ্ছে না,অথচ বুকিং ডট কম এ হোটেল বুকিং করা যাচ্ছে। তাহলে উপায়? এমআর হল মুশকিল আসান। ইস্ট ওয়েস্ট মানি ট্রান্সফার বলে একটা সংস্থা আছে।  এখান থেকে ফোন পে তে টাকা পাঠিয়ে  মালদা থেকে কেউ কুড়ি হাজার ইন্ডিয়ান টাকা এই হোটেল ম্যানেজারের পারশোনাল এ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিল (অবশ্য এর জন্য ২০০ টাকা কমিশন দিতে হয়েছে), আর এই হোটেল ম্যানেজার আশুতোষ কে ৩২০০০ নেপালী টাকা ক্যাশ দিয়ে দিল। ব্যাস টেনশন খতম। ব্যাটারা বলে চলো আঙ্কেল কফি পিতে হ্যায়। আমরা চারজন হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লাম।  
আশুতোষ কে এখন ডাঃ আশুতোষ বলে ডাকা যেতেই পারে।  
  
  
(৭)  
  
চিতওয়ান হল পাহাড়ি জঙ্গল। হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, বাইশন আরও অনেক জন্তুজানোয়ার দেখতে পাওয়া যায় আর দেখা যায় অগুন্তি রংবেরঙের পাখি।  
পোখরা থেকে সকাল এগারোটায় বেরিয়ে চিতওয়ানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল চারটে। মাঝে পেট্রল পাম্পে লাঞ্চ করলাম। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছিল, সব খাবারই শেষ। ছিল সিঙাড়া আর ম্যাগি। পাশে বাগানে নধরকান্তি বেগুন হয়ে ছিল। ম্যানেজার আর কুকটাকে ধরে এনে বললাম আমাদের একটু ভাত আর বেগুনের ভর্তা করে দাও তো বাপু, টাকা দেব, আমাদের বিল লাগবে না। আধঘন্টা বসলাম কিন্তু তৃপ্তিদায়ক খাবার খেলাম। কফিও খেলাম, সঙ্গে কয়েকটা বিসলারির জলের বোতল তবে দুটো কড়কড়ে নেপালী হাজার টাকার নোটের বিনিময়ে।   
চিতওয়ান রিভারসাইড রিসোর্ট। অনেক বড় জায়গা, ঘরগুলোতেও যেন ফুটবল খেলা যাবে। বাচ্ছারা তো সুইমিং পুলে দাপাদাপিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কোন একটা ওষুধের কোম্পানির কনফারেন্সে এসেছে জনা দশেক তামিল লোক, তারা বন ফায়ারের তোড়জোড় করছে। আমরা সুইমিংপুলের পাশে।  সুন্দর একটা কাঠের ডেক চেয়ারে। ওশেনিয়া ব্লু বলে একটা মকটেল দিয়ে গেল সবাইকে। ওটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস। ওয়েটারটাকে পাশে ডেকে পাত্রটা ফেরত দিয়ে আস্তে করে বললাম, ৯০ ভদকা, হাফ চামচে লেবুর রস আর একটা কাঁচালঙ্কা চিরে বিজগুলো ফেলে দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসো। সাথে সাথেই চলে এলো। ম্যানেজারও এলো আলাপ করতে। কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। ব্যাটাকে বললাম যদি হালকা কোনো ইন্ডিয়ান গান বাজতো তাহলে ভাল হত। খুব স্মার্ট ছোকরা, বলে আপনার ফোনটা দিন ব্লুটুথ দিয়ে আপনিই চালান। দেখি প্রতিটা লাইটের তলায় স্পীকার। অরিজিৎ সিং এর ঐ গানটা যেটা হেমন্ত আর লতার ডুয়েট ছিল। বেশ মনোরম স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ। আবার একজন এসে বলল আপনারা কি খাবেন ইত্যাদি। মুরগির বারবিকিউ, পেটের ভেতর সসেজ দিয়ে, মিনিট পনেরো পর আর একটা ৯০ দিয়ে যেও।  
সবাই যে যার ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে বন ফায়ারের একদিকে গোল হয়ে বসলাম। ওখানেই একটা টেবিল লাগিয়ে দিল। মুরগী রোস্ট হল, আগুনের মধ্যে দিয়ে "নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মত লাল"।

(৮)  
  
নেপালে জঙ্গল সাফারি হল না। আমরা অনেক খবরই জানতাম না। তবে আমার বন্ধুটা বলেছিল বর্ষার সময় চিতওয়ানে না যেতে। আমরা ভেবেছিলাম অফ সিজন ডিসকাউন্ট হয়তো পাওয়া যাবে। পুরো জঙ্গল সাফারি যে বন্ধ হয়ে যাবে সেটা বুঝতেই রাত হয়ে গেল। একদম পনেরোই জুন থেকে দু মাসের জন্য সমস্ত রকম জঙ্গল সাফারি বন্ধ। ঐ এলাকার কাছাকাছি গাড়িও যেতে দেবে না। এখন পশুপাখির বাচ্চা হওয়ার সময়। ঐ সময় কোনোভাবেই বিরক্ত করা যাবে না। অনেকভাবে চেষ্টা হল, এমনকি হাতিও চলবে না। চিতওয়ানে একদিনের বুকিংই ছিল। আমরা এখান থেকে চলে গিয়ে লাটাগুড়িতে জঙ্গল সাফারি করব বলে এখানকার সব টাকাপয়সা মিটমাট করে সকাল সকাল রেডি হয়ে নিলাম।  
আজ নেপালকে বিদায় জানানোর পালা। যদিও আগামীকাল পর্যন্ত নেপালের পারমিট আছে তবু লাটাগুড়ির রিসর্টটাও খুব ভাল।   
এখানে অনেকেই ঘরে হাতি পুষে রেখেছে। হাতির মল-মূত্র থেকে অনেক ওষুধ তৈরী হয়, অন্য সময় হাতি সাফারি করে সওয়ারি নিয়ে। যা হোক যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মালপত্র গাড়ির ছাদে। জলখাবার কমপ্লিমেন্টারি ছিল। খানিক খেলাম, খানিক ছাঁদা বেঁধে নিলাম। গাড়িতে অনেকটা ডিজেল ভরা হল। মাঝপথে মানে প্রায় কাকরভিটার কাছাকাছি এসে লাঞ্চ করে পেঁড়া কিনে যার কাছে যত নেপালী টাকা আছে শেষ করে দিলাম। বিকেল চারটের মধ্যেই বর্ডার। কাকরভিটা খুব বড় টাউন। সবচেয়ে মজার লোকজন সব নেপালী ভাষায় কথা বলছে, দোকানের সাইনবোর্ডে সব হিন্দিতে লেখা আর মানুষজন সব দেহাতি, ভোজপুরী, মৈথিলী। বউগুলোও সেই টিপিক্যাল হিন্দুস্তানি, সিনথেটিক শাড়ি, গলা অবধি ঘোমটা দেওয়া, আর ছেলেছোকরাগুলো এককানে দুল পড়ে একমনে গুটখা চিবোচ্ছে।   
তা বর্ডারে কোনো অসুবিধেই হল না, শুধু নেপালের গাড়ির পারমিটটা নিয়ে নিল। আর আমরা পড়লাম ট্রাফিক জ্যামে। পানিট্যাঙ্কি থেকে শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ডের কাছে গ্যারেজে পৌছুতে লেগে গেল পাক্কা দু'ঘন্টা। বৃষ্টিও শুরু হল। আমার গাজলডোবায় চিংড়ি ভাজা দিয়ে আহ্নিক করার প্ল্যানটা ভেস্তে গেল। গাড়ির সমস্ত পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে আগামীকালের কলকাতা যাবার বাস টিকিট নিয়ে চা খেয়ে একটু আড্ডা দিয়ে লাটাগুড়ির পথে রওয়ানা দিতে দিতে আটটা বেজে গেল। লাটাগুড়িতেই খাবারের অর্ডার দিয়ে দেওয়া হল। আমরা ফুলবাড়ি হয়ে চললাম। দেড় দু ঘন্টা লাগবে।

(ফাউ)  
  
খুব বৃষ্টি পড়ছে, আমাদের গাড়ির ড্রাইভারও বদলে গেছে। একটু পরেই লাটাগুড়ি পৌঁছেই গাড়িটাও ছেড়ে দিতে হবে। এ গাড়ির কনট্রাক্ট শেষ। খুব সুন্দর রাস্তা, চকচকে-ভেলভেটি তায় বৃষ্টি হচ্ছে বলে সুন্দরী ডুয়ার্স দুদিকের চাবাগান সবুজ কালো কার্পেট বিছিয়ে অভ্যর্থনা করছে। আমরা লোকেশন ম্যাচ করে রিসর্টে পৌঁছালাম তখন প্রায় রাত দশটা বাজে। খুব ভাল ব্যবস্থা, খুব তাড়াতাড়ি গরম জলে ভাল করে চান করে ডাইনিং এ চলে গেলাম। এখানে ঘরগুলোর মাঝে আলাদা জায়গায় বাঁশের গ্রীল দেওয়া গ্র্যানাইট পাথর বসানো টেবিল আর হাতল ছাড়া বেতের চেয়ার। বাকিদের ফ্রেস হওয়ার আগেই আমার ব্যাগের বাঁচা সিগনেচার ঝুড়ি আলুভাজা দিয়ে সদব্যবহার করে খাবারগুলো একটু দেখে নিলাম। সবার পছন্দের সবকিছু রেডি করে রেখেছে। মাংসটাও একটু টেস্ট করা হল। অনেকদিন পর আলু দিয়ে মাংসের ঝোল পেলাম। আমরা সবাই তো খেলামই, হোটেলের ছেলে দুটোকেও খাওয়ালাম। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। আমাদের মধ্যে কেউই তেমন গানটান জানেনা। শেষে আমাকেই বলল একটা গল্প বলতে।   
- তা কিসের গল্প শুনবি? প্রেমের, বন্ধুত্বের, যুদ্ধের নাকি ঠাকুরের?   
- না না বাবা, তুমি একটা জঙ্গলের গল্প বল। তুমি তো অনেক জঙ্গলে ঘুরেছ।   
- আমি বরং একটা বাঘের গল্প বলি। জঙ্গলের রাজা বাঘ আর গৃহপালিত গরুর গল্প।  
তা একদিন এক জঙ্গলের ধারে এক রাখাল তার গরুকে সবুজ ঘাসের মধ্যে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে অন্য কাজ করতে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর সেখানের সব ঘাস খেয়ে ফেলে গরুটা একটু দূরের ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করছে হঠাৎ করেই গলার দড়িটা খুলে যায়। গরুও অমনি আরও ভাল সতেজ ঘাস খাওয়ার উদ্দেশ্যে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে। ভালই ঘাস খাচ্ছিল এমন সময় রাজা বাঘ এসে হাজির। গরু তো দেখে মহা বিপদ, লোভ করতে গিয়ে কাঁচা বয়সে শেষে প্রাণটাই খোয়াবে? বেগতিক দেখে হাম্বা হাম্বা করতে করতে গ্রামের দিকে ছুট লাগালো। বাঘ এদিকে বুঝতে পেরেছে শিকার নাগালের মধ্যে একটু খেলিয়ে শিকার করব। বাঘও গরুটার পিছু নিল। খানিক দূরে একটা পাঁকের পুকুর ছিল, গরুটা সেখানে ঝাঁপ দিল, হাঁচড় পাঁচড় করে মাঝপুকুরে চলে গেল। বাঘও তার পিছনে পুকুরের কাদা পাঁকের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে গরুকে খুব বকাঝকা শুরু করল।ব্যাটা তোর পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি? আমার কাছ থেকে এভাবে পালাতে পারবি? গরু বলে এখন আমরা দুজনাই ফেঁসেছি, আমি আমার মালিককে ডাকছি, তুমিও তাই কর। বাঘ বলে, যাঃ, আমার আবার মালিক কে? আমি তো রাজা, জঙ্গলে সবাই আমাকে ভয় করে।  
কিন্তু গরু সমানে হাম্বা হাম্বা করেই গেল। সেই শব্দ শুনে গ্রামের লোকজন এসে গরুকে টেনে তুললো আর বাঘকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেললো।  
  
তাহলে মরাল অফ দি স্টোরি কি? গরুর বুদ্ধি বেশী না বাঘের বুদ্ধি কম?  
- বাবা তুমি কিন্তু আমাদের বোকা বানাচ্ছো। এরকম কিছু হয়ই না।  
- আরে এটা তো গল্প, মরালটা হল লোভ করা বা নতুনত্বের স্বাদ নেওয়া ভাল, কিন্তু বুদ্ধি আর কনফিডেন্সটা যেন থাকে।  
  
আরও কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। সামনে অনেকটা লন আছে আর চা গাছের বেড়া দেওয়া খুব যত্ন করে ছাঁটা। কিছুদিন আগেই এখানে বোমকেশ বক্সীর একটা সিনেমার শুটিং হয়েছিল। আমরাও কাল সকালে চারদিক এক্সপ্লোর করব। HDFC ব্যাঙ্ককে ফোন করে খুব কথা শোনালাম।   
  
তারপর ঘুমিয়ে কিন্তু ঠিক পাঁচটায় উঠে পড়েছি। এখানেও জঙ্গল সাফারি বন্ধ।  জুন জুলাই মাসে পৃথিবীর এই প্রান্তে সব সাফারি বন্ধ থাকে। চা বাগান চষে ফেললাম। রিসর্টটা একদম চা বাগানের মধ্যে। ছ'খানা বড় বড় ঘর আছে, তিনটে মোট হাট, একটা হাটে দুটো করে ঘর। একটা টোটো করে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লোকাল সব ঘুরলাম। এখানে টাটার চা বাগান। রোজ ভ্যালির বন্ধ চা বাগান, স্কুল, হেল্থ সেন্টার, বাজার। পেল্লাই সাইজের চাঁপাকলা অবিশ্বাস্য কম দামে। কিছু কাঠ, বাঁশের খেলনাপাতি, চা, মধু এইসব অনেক কিছু কেনা হল। দুপুরে খেয়ে একটু ঘুমিয়ে, বিকেলে গাজলডোবায় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আয়েশ করে চা-টা খেলাম। রাত আটটায় শিলিগুড়ি থেকে ভলভো বাস। ডবল স্লিপার কোচ।